প্রথম আলো

তারিখ ... 18 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১০ ... কলাম ... ৪ ...

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বেতন ও জবাবদিহি

উচ্চ শিক্ষা

আনু মুহাম্মদ

জাতীয় বেতন স্কেল হয়েছে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দাবিদাওয়ার নিষ্পত্তি এখনো হয়নি

জাতীয় বেতন স্কেল মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উত্থাপিত দাবিদাওয়ার নিষ্পত্তি এখনো হয়নি। বহু বছর পরে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বেতন নিয়ে আন্দোলন জাতীয়ভাবে সংগঠিত আকারে দাঁড়িয়েছে। এই আন্দোলনে সরকারপন্থী শিক্ষকদের গ্রুপগুলোও যুক্ত আছে, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য বহু আন্দোলনে হলেও, এখন পর্যন্ত কোথাও এ ক্ষেত্রে সরকারি ছাত্রসংগঠনের কোনো হামলা দেখা যায়নি। তাতে আশা করা যায় যে শান্তিপূর্ণভাবেই এই আন্দোলন অগ্রসর হতে পারবে।

এর আগে বেতন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জাতীয়ভিত্তিক বড় আন্দোলন হয়েছিল ১৯৮৬-৮৭ সালে। সামরিক স্বৈরতন্ত্রবিরোধী আন্দোলনের পাশাপাশি তখন বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার আন্দোলন বিস্তৃত হচ্ছিল। শিক্ষকদের আন্দোলনও তখন বেশ শক্তিশালী আকার নিয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের নেতৃত্বেই এই আন্দোলন হচ্ছিল, তখন এর সভাপতি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কে এম সাদউদ্দীন এবং মহাসচিব ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মঈনুল ইসলাম। আমি ওই দুই বছরই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ছিলাম, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের যুগ্ম মহাসচিবের দায়িত্বও পালন করতে হয়েছিল।

সে বছরই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের উদ্যোগে এ বিষয়ে একটি জাতীয় সেমিনার হয়েছিল। সেখানে উপস্থাপনের জন্য প্রবন্ধের কাজ করতে গিয়ে আমি দেখেছিলাম, শিক্ষকদের বেতন ১৯৭২ সালের তুলনায় আর্থিক পরিমাণে বেড়েছে, কিন্তু প্রকৃত আয় হয়ে গেছে তিন ভাগের এক ভাগ। আরও দেখেছি, সমাজে বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মধ্যে সামাজিক অবস্থান যাঁর যত কম, প্রকৃত আয় হ্রাস তাঁর তত বেশি। সভা, সেমিনার, মিছিল, স্মারকলিপি, ধর্মঘট—সবকিছু হচ্ছিল, তার একপর্যায়ে সরকার গঠিত কমিটির সঙ্গে আমরা বৈঠকেও বসেছিলাম। সংস্থাপনসচিবের নেতৃত্বে বেশ কয়েকজন সচিব ছিলেন আলোচনায়। আলোচনা হয়েছিল বটে, কিন্তু পরিষ্কার বোঝাই যাচ্ছিল সচিবেরা এ বিষয়ে কথা বলতে বা শুনতে খুবই অনিচ্ছুক, এরশাদ সরকারের লোক দেখানো কর্মসূচির অংশ হিসেবে তাঁরা আলোচনা করলেন, তাই তার কোনো অগ্রগতি হয়নি।

১৯৮৭ সালের শেষ দিকে এরশাদ পতনের আন্দোলন বেগবান হয় এবং আড়ালে চলে যায় অন্য সব আন্দোলন। আন্দোলনের ব্যাপক বিস্তৃতির মুখে এরশাদ জরুরি অবস্থা দেন। শিক্ষক সমিতি থেকে জরুরি অবস্থা প্রত্যাখ্যান করে আমরা মিছিল করেছিলাম। ছলে ও বলে ভোটারবিহীন নির্বাচন হয়, এরশাদ সরকারের যাত্রা অব্যাহত থাকে। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকনেতারাও কেউ কেউ এরশাদ সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। কেউ কেউ উপাচার্য হওয়ার জন্য এরশাদের কাছে ধরনা দেন। এরপর আর আন্দোলন দাঁড়ায়নি। গত প্রায় তিন দশকে বেতন নিয়ে আর সে রকম দাবিদাওয়া সংগঠিত হয়নি। এর মধ্যে নিয়মমাফিক একাধিক বেতন স্কেলে শিক্ষকদেরও বেতন কিছু বেড়েছে। কিন্তু প্রকৃত আয়ের ক্ষেত্রে বারবার অন্য অনেকের মতোই হোঁচট খেয়েছেন শিক্ষকেরাও।

কাঠমান্ডুতে এক সেমিনারে যোগ দিতে গিয়ে পাকিস্তান, ভারত ও নেপালের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তাঁরা বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না বাংলাদেশের পাবলিক বা সর্বজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন এত নিচে; কোথাও তাঁদের তিন ভাগের এক ভাগ, কোথাও অর্ধেক। প্রকৃত আয়ের এই নিম্নহার শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ক্ষেত্রে নয়, অন্য সব পর্যায়ের শিক্ষক, পেশাজীবী ও শ্রমজীবী মানুষের জন্যও সত্য। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন দেশের জাতীয় আয় এবং পেশাজীবী বা শ্রমজীবী মানুষের আয়ের অনুপাত করলে বাংলাদেশে এই অনুপাত পাওয়া যায় নিচের দিকে।

সুতরাং, বেতন ও মজুরির নিম্নহার বিষয়টি জাতীয় সমস্যা। কলেজ ও স্কুল পর্যায়ের শিক্ষকদের বেতন নিয়ে আন্দোলন এবং তাঁদের ওপর দমনপীড়নের ঘটনা আমরা বারবার দেখেছি। এখনো বেসরকারি স্কুল পর্যায়ের শিক্ষকদের বেতনকাঠামো খুবই কম। সামষ্টিক সমাধানের সম্ভাবনা না দেখে অনেকে এখন সমাধানের পথ খুঁজছেন ব্যক্তিগতভাবে। তার ফলে স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের মধ্যে প্রাইভেট টিউশনি করা ও কোচিং সেন্টারে যুক্ত হওয়ার প্রবণতা আশঙ্কাজনক মাত্রা নিয়েছে। শিক্ষার্থীদের বাধ্য করার ঘটনাও ঘটছে নানাভাবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও এ রকম কিছু পথ ব্যক্তিগত সমাধান হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে। কনসালট্যান্সিসহ কিছু আয়-উপার্জনের পথ আগে থেকেই ছিল। নব্বই দশকের শুরু থেকে বেসরকারি বা বাণিজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু। চাহিদা ও মুনাফাযোগ্যতা উৎসাহব্যঞ্জক হওয়ার কারণে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সংখ্যা পরবর্তী বছরগুলোতে বেড়েছে দ্রুত। ক্রমে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষকতা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আয় মোকাবিলার অন্যতম পথ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে এটা এমন এক আকার নিয়েছে যে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকটি বিভাগের অনেক শিক্ষকের প্রধান আয় দুই-তিন বা ততোধিক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের খণ্ডকালীন শিক্ষকতা থেকেই আসে। ফলে তাঁদের শিক্ষাদানের বড় সময়টাও সেখানেই যায়। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়েরও খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়ে অনেক খরচ বাঁচে। বস্তুত প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় এখন চলছে প্রধানত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দিয়েই।

গত কয়েক বছরে আয়-উপার্জনের আরেকটি পথ খুলেছে, সেটি হলো নিজেদের বিভাগেই 'উইক এন্ড' বা 'ইভিনিং শিফট' খোলা। অর্থ উপার্জন ছাড়া এর আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। প্রথমে একটি-দুটি বিভাগে শুরু হলেও সংক্রমণ হচ্ছে দ্রুত। এগুলো একই বিভাগের মধ্যে সম্পূর্ণ ভিন্নজগৎ তৈরি করছে, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত হয়ে দূরে ঠেলে দিচ্ছে বিভাগের নিয়মিত শিক্ষার্থীদের। যেহেতু এসব 'প্রোগ্রামে'র শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বেশি বেতন নেওয়া হয়, সুতরাং তাঁদের দিকে মনোযোগও বেশি যায়। পাবলিক বা সর্বজন প্রতিষ্ঠানের ভেতর অঘোষিত এই প্রাইভেটাইজেশন বা ব্যক্তি মুনাফানির্ভর ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্কুল পর্যন্ত সর্বত্রই ঘটছে। এখান থেকে এখন অনেক শিক্ষকের মূল আয়ও সংগঠিত হয়। অর্থাৎ শিক্ষার সর্বব্যাপী বাণিজ্যিকীকরণ ঘটছে সর্বজন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের ওপর ভর করেই, তাঁদের সীমিত আয়ের সুযোগ নিয়ে।

বর্তমানে তাই সর্বজন বিশ্ববিদ্যালয় তার নিজের শিক্ষকদের সময় ও মনোযোগ আগের তুলনায় অনেক কম পাচ্ছে। শিক্ষা, গবেষণা, প্রকাশনা এখন তাই অগ্রাধিকারের নিচের দিকে। বহু শিক্ষক এখন সারাক্ষণই দৌড়াচ্ছেন। এই দৌড় তাঁদেরও গবেষণা প্রকাশনা, সর্বোপরি শিক্ষকতায় মনোযোগ দেওয়ার জন্য অবসর দিচ্ছে না। অর্থের চাহিদা ও জোগান তাঁদের সারাক্ষণই অস্থির রাখছে। কারও কারও পক্ষে অগ্রাধিকারের তালিকায় নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস-পরীক্ষা-খাতা দেখা সবার নিচে।

এই পরিস্থিতির পরিবর্তনের সূচনা করতে গেলে বেতন বৃদ্ধি কিংবা প্রকৃত আয় রক্ষা এবং মর্যাদা রক্ষার বিষয়টি খুবই যৌক্তিক, সন্দেহ নেই। কিন্তু আমরা যারা সর্বজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, তাদের বেতন আসে জনগণের করের টাকা থেকে। আমরা জনগণের অর্থে প্রতিপালিত এবং শিক্ষা, গবেষণা এবং সর্বজনের স্বার্থে সামাজিক দায়দায়িত্ব পালনের জন্য নৈতিকভাবে দায়বদ্ধ। বাংলাদেশের যেকোনো নাগরিক আমাদের কাছে প্রশ্ন তুলতে পারেন। প্রশ্ন আমরা অনেক শুনছিও এখন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি আমরা জানি। সর্বজন বিশ্ববিদ্যালয়কে দলীয় ও গোষ্ঠীগত সম্পত্তি বানানোর অপচেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন প্রকৃতপক্ষে মাস্তান ও মেরুদণ্ডহীনদের হাতেই ক্ষমতা। সন্ত্রাস ও সংঘাতে শিক্ষার পরিবেশ বিপর্যস্ত, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষক পীড়িত। বিশ্ববিদ্যালয় হলসহ প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষকদের তুলনায় সরকারি ছাত্রসংগঠনের একচ্ছত্র আধিপত্যে নৈরাজ্য ও নিরাপত্তাহীনতা বেড়েছে। প্রশাসন এই অবস্থা মেনে নেয়। কারণ তাদেরও নির্ভর করতে হয় সরকারি অনুগ্রহের ওপর। এগুলোকে যাঁরা সুবিধা বা অনুগ্রহ বলে বিবেচনা করেন, সেই শিক্ষকদের মধ্যেও সরকারি আনুগত্যনির্ভর দল তৈরির প্রবণতা বেড়েছে।

বর্তমানে প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' 'বঙ্গবন্ধুর আদর্শ' ইত্যাদি শব্দাবলির ব্যানারে একাধিক দল ও সংগঠন দেখা যায়। শিক্ষকদের মধ্যে এই দলীয় ব্যানার ব্যবহার কোনো রাজনৈতিক, আদর্শগত কারণে যে ঘটেনি, তা শুধু এই তথ্য থেকেই পরিষ্কার হবে যে এসব সংগঠনের জন্ম এবং দ্রুত এর সদস্য বৃদ্ধি—সবই ঘটেছে ২০০৯ সালের পরে। এর আগে 'জাতীয়তাবাদী আদর্শ' বা 'জিয়া পরিষদ' ইত্যাদি দেখা যেত বেশি। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকায় প্রথম ধরনের সংগঠনের বিস্তার ঘটেছে খুব দ্রুত। 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' বা 'বঙ্গবন্ধুর আদর্শ' নিয়ে মাথাব্যথা বা বর্তমানের মতো এত অস্থিরতা আগের সরকারের আমলে এদের অনেকের মধ্যেই দেখা যায়নি।

শিক্ষকদের এসবের কী প্রয়োজন? কিংবা তাঁরা এগুলোতে এত সক্রিয় হচ্ছেন কেন? হচ্ছেন এই কারণে যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের জন্য কেউ আগ্রহী হলে বা অন্য কোনো সুবিধা পেতে গেলে অথবা অসুবিধা থেকে বাঁচতে গেলে তাঁকে ৩২ ধরনের কোনো ছায়ার নিচে আশ্রয় নিতে হয়। পরিস্থিতি এ রকমই। উপাচার্য থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনে নিয়োগ এখন এতই দলীয় ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় যে মেধা বা যোগ্যতার প্রশ্ন অনেক নিচে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের কিংবা তাঁদের অভিভাবকদের উদ্বেগের বিষয় এখন দুটি : ১. নিরাপদে সময়মতো পাঠ সম্পন্ন করা। ২. নিয়মিত ক্লাস, পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়া। এই দুই ক্ষেত্রেই এখন বহুবিধ জট তৈরি হয়েছে, এর পেছনে ওপরের কারণগুলোই। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আমলাতান্ত্রিক পথে এসব সমস্যার সমাধান হবে না। কিন্তু সমস্যা শুরুতর বলেই এর সমাধানের পথ, জবাবদিহির পথ শিক্ষকনেতাদেরই নিশ্চিত করতে হবে।

যথেষ্ট না হলেও বা পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সঙ্গে তুলনীয় না হলেও অন্যদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরও বেতন বাড়ছে। আশা করি এখন জবাবদিহিও বাড়বে। ক্লাস পরীক্ষা নিয়ে অনিয়ম কমবে। বেতনের পাশাপাশি মর্যাদা নিয়েও দাবি উঠেছে। তবে এই মর্যাদা উদ্ধার বা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথমত, সর্বজনের কাছে জবাবদিহির প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, যে শিক্ষকেরা কিঞ্চিৎ সুবিধা পাওয়ার জন্য সন্ত্রাসী বাহিনীর কোলে আশ্রয় নেন, কিংবা সচিবালয়ে গিয়ে আমলাদের সামনে হাত কচলান, বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁদের আধিপত্য দূর করতে হবে। আর তৃতীয়ত, নিজেদের সম্মান দিতে জানতে হবে। সমাজ শিক্ষককে অনেক ওপরে স্থান দেয়। সেখানে শিক্ষক যদি নিজেকে সম্মান করতে না পারেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা যদি নিজেদের অধ্যাপক, উপাচার্য এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারপারসনের চেয়ে 'মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদাসম্পন্ন' বলায় বেশি গৌরববোধ করেন, তবে তাঁদের সম্মান কেউ রক্ষা করতে পারবে না।

● আনু মুহাম্মদ : অর্থনীতিবিদ ও অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়